হিজরতের পথে অবিচল

এক বাংলাদেশী নারীর ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনী

আসমা বিনতে হুসাইন

হিজরতের পথে অবিচল

এক বাংলাদেশী নারীর ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনী

আসমা বিনতে হুসাইন



AL HIKMAH MEDIA

[এই ঈমানদীপ্ত কাহিনীটি খোরাসান থেকে প্রকাশিত “নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ” ম্যাগাজিন – আগস্ট ও সেপ্টেম্বর-২০১৯ ইংরেজি সংখ্যা থেকে থেকে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। মুল উর্দু প্রবন্ধটি লিখেছেন একজন পাকিস্তানী মুজাহিদাহ বোন আসমা বিনতে হুসাইন]

খোরাসানের পুণ্যভূমিতে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পথে অবিচল এক বাংলাদেশী নারীর ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনী

মেয়েটির নাম হামিদা। সে তার পিতা-মাতার ছোট মেয়ে। তার পিতা বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীতে খুব ভালো একটা চাকরি করতেন। তার পিতার সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু ছিল তার দুই মেয়ে। একারণে সুখ-শান্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও পিতা-মাতার ভালবাসায় ভরপুর ছিল তাদের পরিবার। হামিদা জীবনে এমন কোন পেরেশানীর সম্মুখীন হয়নি, যা তাকে জীবন সম্পর্কে অপ্রসন্ন করে দিবে। জীবনের প্রাথমিক বছরগুলো এমনি আনন্দের দোলায় কাটছিল যে, সে টেরই পায়নি কিভাবে জীবন থেকে বছরগুলো চলে গিয়েছিল।

তার বয়স যখন ২২ বছর, তখন সে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে। মাতা-পিতা তার জন্য উপযুক্ত সম্বন্ধ আসার পর বিবাহ দিয়ে দেন। বিবাহের পর যখন সে শ্বশুরালয়ে পৌঁছালো, তখন সেখানে সুন্দর একটি পরিপাটি বাড়ি তার জন্য অপেক্ষমান ছিল। তার স্বামী ভাইদের মাঝে সবচেয়ে ছোট ছিল। ঘরে ননদ ও ভাবীরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সকলেই মন উজাড় করে সুশ্রী হামিদাকে সাদরে বরণ করে নেন। শ্বশুরবাড়িতে তার কাজ বলতে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে সেটা ছিল শাশুড়ির সাথে বসে বসে সবজি কাটা। বাকী সকল কাজ ননদ ও ভাবীরা নিজেরাই করে নিতো।

হামিদার মায়ের আশা ছিল, মেয়ে যেহেতু পড়ালেখার ব্যস্ততার কারণে গার্হস্থ্য কাজ শিখার সুযোগ পায়নি, তাই এবার হয়তো সেগুলো শ্বশুরালয়ে শাশুড়ি ও ভাবিরা পুরোপুরি শিখিয়ে দিবে। কিন্তু শ্বশুরালয়ের সবাই তাকে এমন ভালোবাসতো যে, গার্হস্থ্য কাজ আর তার শেখা হলো না। তাই সে যতদিন সেখানে ছিল, ততদিন এমন আরাম-আয়েশে জীবন অতিবাহিত করেছিল যে, হামিদা নিজের মায়ের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির মাঝে কোন পার্থক্য অনুভব করতে পারেনি।

এই সময়ের মাঝেই আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। কিন্তু এখনো সে তাকে ভালো করে দেখতে পারেনি, সে অবস্থাতেই সেই নতুন পুষ্পকলি যেখান থেকে এসেছিল, সেখানে আবার ফিরে গেল। অর্থাৎ মারা গেল। সম্ভবতঃ এটাই প্রকৃত অর্থে এমন দুঃখ-কষ্ট ছিল, যা জীবনে সে প্রথম পেয়েছিল। সে ছেলের মৃত্যুকে ভুলতে পারছিল না। এই শোকাতুর অবস্থার কিছুদিন যেতে না যেতেই তার স্বামী আবু খলিল তার নিকট এক কঠিন প্রস্তাব রাখলেন।

এমনিতে আবু খলিল স্বামী হিসাবে হামিদার প্রতি খুব গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখতো। আর স্বভাবগতভাবেই সে খুব মিতভাষী ছিল। কিন্তু স্ত্রীর প্রয়োজনাদি ও অনুভূতিগুলোর প্রতি সে খুব খেয়াল রাখত। এমনিভাবে যখন থেকে তার বিবাহ হয়, তখন থেকেই বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও উম্মতে মুসলিমার অপদস্ত হালাত নিয়ে হামিদার সাথে মতবিনিময় করত। তারা উভয়েই এই মতাদর্শের উপর ঐক্যমত ছিলেন যে, এই অপদস্থতা ও নীচুতার হালাত থেকে পরিত্রানের কোন রাস্তা যদি থেকে থাকে, তবে সেটা হলো: 'জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ্'। তাছাড়া আবু খলিল নিজের উপার্জন থেকে অধিকাংশ সময়ই কিছু না কিছু মাল জিহাদ ও মুজাহিদদের জন্য ব্যয় করতেন। কিন্তু অন্যদিকে এটাই সর্বপ্রথম পর্যায় ছিল যে, আবু খলিল হামিদাকে দ্বিমুখী রাস্তার উপর এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কারণ আবু খলিল বাংলাদেশ থেকে জিহাদী ভূমির দিকে হিজরত করতে চাইছিলেন। তখন হামিদার সামনে দু'টি পথের যে কোন একটিকে গ্রহন করে নেওয়ার প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল-

এক. সে নিজের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, স্বদেশ সব কিছু ত্যাগ করে, তার স্বামীর সাথে হিজরত করে চলে যাবে এবং দুর্দশার জীবন গ্রহন করে নিবে। এ কথা জানার পরেও যে, জীবনে দ্বিতীয়বার তাদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

দুই. অথবা নিজের জীবন ব্যবস্থাকে অক্ষত রাখার উদ্দেশে নিজ স্বামীকে এমন চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে।

সে আরো জানতো যে, জিহাদ ও হিজরতের জীবন গ্রহন করার মানে হলো: নিজেকে নিজে সবর ও ধৈর্যের এমন স্তরে নিয়ে যাওয়া; যেখানে আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ সাহায্যকারী হিসাবে থাকবে না। সেখানে পদে পদে অনেক মুসিবত, বিভিন্ন পেরেশানী এবং বিপদ সংকুল অবস্থা তাদের জন্য অপেক্ষা করবে। আর এ পথের শেষ হিসেবে যদি কোন কিছু দেখা যায়, তবে সেটা হলো: একাকিত্ব, শাহাদাতবরণ, আহত হওয়া এবং অন্ধকার প্রকোষ্টে জীবন যাপনের কষ্ট সহ্য করা।

কিন্তু কেন জানি! যখন আবু খলিল এ ব্যাপারে তার মতামত জানতে চাইলেন, তখন একবারের জন্যও তার হৃদয়ে একথার উদয় হয়নি যে, সে তার স্বামীকে এমন বিপদ সংকুল জীবন থেকে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে রাখবে। মন-মস্তিস্কে যদি কোন কথার উদয় হয়েই থাকে, তবে সেটা হলো: আমরা তো এই পথের পথিক হয়েই গেছি। এখন আর পিছনে ফিরে আসার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু সে বার বার এই চিন্তা করতো যে, আমাদের সামনে বাড়ার হিম্মত আছে তো?

অবশেষে এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব অবস্থায় আল্লাহর মুহাব্বত, তাঁর জান্নাত পাওয়ার আকাঙ্খা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের স্পৃহা দুনিয়ার সবকিছুকে পিছনে ফেলে বিজয়ী হয়। তাই সে তার স্বামীর সাথে হিজরত করে পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান নামক এলাকায় চলে আসে। বিলাসবহুল জীবন, সুখ-স্বাচ্ছন্দে ভরপুর পরিবেশে বেড়ে উঠা তানিয়া প্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। নিজের বাড়িতে তো সে কখনো ঠান্ডা-গরমের কোন পার্থক্য অনুভব করেনি। কিন্তু ওয়াজিরিস্তানে লাকড়ি জ্বালাতে যেয়ে তার ধোঁয়ায় কাশতে কাশতে দুনিয়ার বাস্তবতা বুঝতে পারে। সেখানে হামিদা হাজারো চেষ্টা করা সত্ত্বেও নিজের শরীরকে গরম রাখতে পারতো না। এই সমস্ত বিপদাপদের পরীক্ষায় সবর করার বিনিময়ে মহান রাব্বুল আলামীন যে সমস্ত পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন, তা মনে করে হামিদা সবর করার আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন।

অতঃপর দেখতে দেখতেই কয়েক বছর পার হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের ফায়সালা অনুযায়ী তাদেরকে ছেলে দিয়ে আবার নিয়ে গিয়েছিলেন। তারা এই পরীক্ষায় সবর করার কারণে এখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘরকে রহমত ও বরকতসমূহ দ্বারা ভরপুর করে দেন। ডাগর ডাগর চোখ ও হাসিমুখের হাবিবা, লজ্জাবতী খাদিজা এবং সকলের আদরের দুলালী হাফসা তাদের ঘরকে সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখে।

হামিদা নিজেকে ও তার সন্তানদেরকে এমনভাবে ওয়াজিরিস্তানের গ্রামীণ জীবনের সাথে মানিয়ে নেয় যে, তাদেরকে দেখে কোন দর্শনকারীর চিন্তা-ভাবনা ও ধারণাতেও একথা কখনো আসবে না, *এই অভিজাত রমনী বাংলাদেশের এমন একটি ধনী পরিবারের সাথে সম্পর্কিত, যে পরিবারে পানি পান করানোর জন্যও খেদমতের চাকর প্রস্তুত থাকে। ফ্রিজ এবং মাইক্রোওয়েভ সুবিধার সাথে অভ্যস্ত হামিদা এখন তিন বেলা নিজ হাতে টাটকা খাবার রান্না করে! বিভিন্ন আইটেমের খাবার খাওয়ার অভ্যাস ছিল যার, সে এখন সাধারণ মানুষের মত এক বিশেষ ধরনের খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে! অর্থাৎ ফ্রাই, ছোলা, মটরশুটি এবং মসুর ডাল। সে এমন স্থানে বসবাস করত, যেখানে রাত(অন্ধকার)ই হত না, আর সে এখন বিদ্যুৎ না থাকার দরুন পুরো সন্ধ্যা জুড়ে টর্চ-লাইটের আলোতে নিজের সর্বশেষ কাজ গুছিয়ে তারপর ঘুমাতে যায়! খোলা বারান্দায় ও প্রশস্ত ঘরে বসবাসে অভ্যস্ত হামিদার আজ পুরো সংসার একটি ছোট্র কামরাকে ঘিরে। আবার সেই ছোট্র কামরাতেই রান্নাঘর, বেডরুম এবং বৈঠকখানা!*

একে তো গ্রামীন জীবন, তার উপর আবার জিহাদী জীবন। যে জীবনে নিজ সকাল-সন্ধ্যার উপর মানুষের স্বাধীনতা খুব কমই থাকে। আকাশে উড়ন্ত ড্রোন বিমান বিদ্যমান থাকার কারণে সে ও তার সন্তানরা সকলেই একটি আবদ্ধ কামরায় অবস্থান করতে হত। কারণ, গোয়েন্দাদের নজরে পড়ার সম্ভাবনা থাকায় তাদের বাহিরে বের হওয়ার অনুমতি ছিল না। এমনিভাবে কোন অভিযান অথবা আক্রমণের আশংকা হলে ততক্ষনাৎ সেখান থেকে নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর জন্য মাল-সামানা প্রস্তুত করে রাখা লাগতো।

কয়েকবার এমনও হয়েছে যে, হামিদা তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্থানীয় আনসারদের সাথেই ঘর ছেড়ে পালাতে হয়েছে।

হিজরতের পর তখনো বেশী দিন অতিক্রম হয়নি। এমতাবস্থায় সে হাবিবা জন্মের পরে খুব কঠিন একটা সময় পার করে। সে সময় হামিদা যে এলাকায় অবস্থান করছিলো সেখানে সেনাবাহিনীর অভিযানের দরুন তাকে নিজ ঘর ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়। আবু খলিল তখন বাড়িতে ছিল না। একারণে স্থানীয় আনসারের সাথেই সফর করতে হয়েছিল। তখনও পর্যন্ত সে স্থানীয় ভাষা বলতে পারতো না। ছোট হাবিবাকে কোলে তুলে নিয়ে, আল্লাহর উপর ভরসা করে সে বের হয়ে গিয়েছিল।

আনসারের পুরো পরিবার এলাকা ত্যাগ করছিল। সামান্য কিছু আসবাবপত্র গাধার পিঠে বোঝাই করা ছিল। আর পায়ে হেটে সফর করতে হচ্ছিল। তাদের ইচ্ছা এই ছিল যে, পাহাড়ের অপর প্রান্তে বিদ্যমান বস্তিতে পৌঁছে যাওয়া। যেখানে আনসারের কতিপয় আত্মীয়-স্বজন বসবাস করতো। এই পথ পাড়ি দিতে ৬/৭ ঘন্টা সময় পায়ে হেটে যেতে হয়। সফরের সময় পরিশ্রমী পশতুন আদিবাসী, যাদের সারা জীবন পাহাড়ের উপর উঠা-নামাতে কেটেছে, তারা খুব দ্রুতই সামনে এগিয়ে গেলো। এদিকে অনভিজ্ঞ হামিদা, এক মাসের বাচ্চা মেয়েকে কোলে নিয়ে, পাহাড়ী উঁচু-নিচু পথ পাড়ি দিয়ে, খুব কষ্টে নিজেকে ও নিজ সন্তানকে সামলাতে গিয়ে অনেক পিছনে পড়ে যায়।

এমন সময় আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়। বিপদ সংকুল অজানা পথ, ছোট্র শিশু, পাশে কোন সাহায্যকারী বিহীন অবস্থায় চলতে হচ্ছিল। আনসারের পরিবারের সদস্যরা এতটাই এগিয়ে গিয়েছিল যে, তারা দৃষ্টি সীমার বাহিরে চলে গিয়েছিল। আর হামিদা আনসারের অনুসরণে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তথাপি সামনে কাউকে দেখতে না পেয়ে, হামিদা একটি গাছের নিচে বসে পড়ল। সেই উদ্বিগ্ন ও একাকিত্বের হালাতে সাহায্যের জন্য কাকে ডাকা যায়? তাকেই তো ডাকা যায়, যিনি সকল সমস্যায় সর্বদা সঙ্গ দিয়েছেন।

যিনি কণ্ঠনালির চাইতেও কাছে অবস্থান করেন। সুতরাং সে গাছে হেলান দিয়ে, দুধের ছোট্র শিশু হাবিবাকে কোলে জড়িয়ে ধরে আপন প্রভু আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে ডাকতে লাগল। আর পরম দয়াশীল ও মেহেরবান প্রভু সাথে সাথেই তার আহবানে সাড়া দিলেন এবং তাকে সাহায্য করলেন। এর অল্প কিছুক্ষণ পরই তার আনসার তাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে পৌঁছালেন। আনসার তাদেরকে গাছের নিচে সহীহ সালামতে দেখতে পেয়ে আত্মায় যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। কারণ তার আশংকা হয়েছিল যে, এমন প্রচন্ড বোম্বিংএর সময় সে পিছনে রয়ে গেল, না জানি কোন গুলি বা বোমার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে কিনা!

২০১৪ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ওয়াজিরিস্তানে অভিযান চালানোর ঘোষণা দেয়। তখন মুহাজির মুজাহিদীনদের পরিবারগুলোকে তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার বা অন্য কোন সুরক্ষিত স্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার ফয়সালা হয়। যারা দেশে ফিরে যেতে পারবে, তারা ফিরে গেলো। আর যারা গোয়েন্দা সংস্থার লোকদের নজরদারীতে ছিল এবং যাদের ঘর তখন আর নিরাপদ থাকেনি, তাদের জন্য এমন কিছু আনসারের ব্যবস্থা করা হল, যারা তাদেরকে তাদের বাড়িতে আশ্রয় দিবে।

হামিদার দেশের বাড়ি অনেক দূরে ছিল এবং ঐ স্থান পর্যন্ত পৌঁছানোর কোন ব্যবস্থাও তখন বিদ্যমান ছিল না। তাই তাকে পাকিস্তানেরই একটি শহরের এক আনসার তার বাড়ির উপর তলায় থাকার জন্য জায়গা দেয়। এই আনসার তার প্রতি অনেক খেয়াল রাখত, তার সকল প্রয়োজন মেটাতো এবং তার হেফাজতের জন্য সদা সচেষ্ট থাকত। কিন্তু পাকিস্তানে এভাবে লুকিয়ে বসবাস করা তার জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। কারণ, তার ও তার তিন সন্তানদের চেহারা-সূরত ও কথা-বার্তার ধরণ দ্বারা খুব দ্রুতই তাদেরকে চেনা যেত যে, তারা এখানকার অধিবাসী নয়। তাই বাধ্য হয়েই তাকে নিজ আনসারের ঘরে সম্পূর্ণরূপে বন্দী জীবন কাটাতে হচ্ছিল। কারো সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার কোন সুযোগ ছিল না। আশেপাশের লোকেরা এটা জানতো যে, ঐ বাড়ির উপরের তালাটি খালি পড়ে আছে এবং সেখানে কেউ থাকে না। সুতরাং এই ধারণাকে ধরে রাখতে গিয়ে তাকে ও বাচ্চাদেরকে জানালার পাশে যেতে পর্যন্ত

সতর্কতা অবলম্বন করতে হত। এমনিভাবে বাড়িতে যদি বাহির থেকে কোন মেহমান বা অন্য কেউ আসতো, তখন তাদেরকে ফিসফিসিয়ে কথা বলতে হত। এই ভয়ে যে, কোনভাবেই যেন তার বা বাচ্চাদের আওয়াজ নিচতলায় বিদ্যমান মেহমানদের পর্যন্ত পৌঁছে না যায়।

ছোট ছোট বাচ্চারা, যাদের বর্তমান বয়সই ছিল খেলা-ধুলা আর হৈ-চৈ করার, তাদেরকেই যখন হামিদা জোড়ে কথা বলতে নিষেধ করতো অথবা ঘরে দৌঁড়াদৌঁড়ি করতে ও জানালার পাশে যেতে বারণ করত, তখন বাচ্চারা স্বাভাবিকভাবেই রেগে যেত। কিন্তু সে তাদেরকে কিভাবে বুঝাবে যে, আমাদেরকে এখানে এমনভাবে থাকতে হবে, যেন এখানে কেউ থাকেই না। সব সময় এমন শাসনে বাচ্চারা বিরক্ত হয়ে উঠছিল। অতঃপর যখন তিন বাচ্চাকে সামলানো হামিদার জন্য অসম্ভব হয়ে দেখা দিতে লাগলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ভিন্ন পথ দেখিয়ে দিলেন। সেটা হলো: হামিদা বাচ্চাদের হাতে রঙ ধরিয়ে দিয়ে বলল যে, তোমরা খেলাধুলা করার পরিবর্তে, বসে বসে ছবি আঁক এবং তাতে রঙ কর।

ওয়াজিরিস্তানের ভূমি মুজাহিদদের হাতছাড়া হয়ে গেলে, তার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা আফগানিস্তানের ভূমি তাদের জন্য প্রশস্ত করে দিলেন। ফলে মুজাহিদীনরা আফগানিস্তানে হিজরত করলেন। আবার ঘর-বাড়ি আবাদ করলেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জীবনের শেষ নিঃশ্বাস বাকী থাকা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে ওয়াদাবদ্ধ হলেন। তারপর নিজেদের এই ওয়াদা পুনরায় পূরণ করার ক্ষেত্রে বিজয়ী হলেন। এদিকে স্বামীর পক্ষ থেকে হামিদার নিকট খুব দ্রুতই সংবাদ আসলো যে, সে আফগানিস্তানে এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করবে। আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী, প্রাচ্যের এই মহিয়সী মেয়ে হামিদা, তার স্বামীর এ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই সব দুঃখ-কষ্ট ও বিরহ-যাতনা এবং বিপদাপদের কথা ভুলে গিয়ে পুনরায় জিহাদের ময়দানে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। সেই জন্য তিন বাচ্চাকে সাথে নিয়ে হামিদা আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে সফর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন।

গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই পথিমধ্যে জানতে পারলেন যে, তার জীবন সাথী, সফরসঙ্গী, যার সাথে জিহাদ ফি-সাবীলিল্লাহর মত কণ্টকাকীর্ণ পথ গ্রহন করেছিলেন, সেই তাকে মাঝ পথে রেখে, আপন গন্তব্যের পথ, আপন জান্নাতে চলে গেছেন। নিজের সফর পুরা করে আপন রবের কাছে মেহমান হয়ে গেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।)

যখন আবু খলিল রহ. এর শাহাদাতবরণের সংবাদ তার নিকট আসে, তখন সে পথিমধ্যে এক আনসারের বাড়িতে অবস্থান করছিল। আনসার পুরুষদের মাধ্যমে যখন আনসার নারীরা এ সংবাদ পান, তখন দুঃখ ও পেরেশানীর দরুন তাদের চোখ বারবার অশ্রুসজল হয়ে উঠছিল। এ কথা ভেবে তাদের সবচেয়ে বেশি পেরেশানী হচ্ছিল যে, তারা হামিদাকে এ সংবাদ কিভাবে দিবে? যে নাকি এতদিন পর আপন স্বামীর সাথে সাক্ষাত করতে ইচ্ছা করছে এবং তিন বাচ্চাকে সঙ্গী করে আরেকবার হিজরতের সফর শেষ করছে। বাড়ির মহিলারা বার বার গোপনে পরস্পরে পরামর্শ করত, আর চোখের নির্গত অশ্রু মুছত। যখন হামিদা সেখানে চলে আসতো, তখন তাকে দেখা মাত্রই তারা চুপ হয়ে যেত। হামিদাও মহিলাদের এমন অস্বাভাবিক আচরণ অনুভব করতে পারত। পাশাপাশি এটাও সে অনুমান করতে পারত যে, তারা তার ব্যাপারেই কোন কিছু গোপন করছে। কারণ, মহিলারা তাকে দেখা মাত্রই কথা-বার্তার বিষয়বস্তু পাল্টে দিত অথবা চুপ হয়ে যেত। অন্যদিকে মহিলাদের এমন অসম্পূর্ণ আচরণের কারণে হামিদাকে খুব পেরেশানীতে ফেলে দেয় এবং ক্রমান্বয়ে তা রাগে-ক্ষোভে রূপান্তরিত হতে থাকে। অবশেষে যখন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, তখন সে মহিলাদেরকে স্পষ্টভাবেই তাদের অস্বাভাবিক আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করে বসে। প্রতিউত্তরে তারা তাকে আবু খলিল রহ.এর শাহাদাতবরণের সংবাদ শোনায়। এ খবর শুনার পর সে একেবারেই চুপ হয়ে মাথা নিচু করে ফেলল এবং কামরা থেকে বের হয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ যদিও তার চোখে অশ্রু আসেনি, কিন্তু যখন আসে তখন বর্ষার ন্যায় অনবরত অশ্রু ঝরতে থাকে। আবু খলিল ছিল তার জীবন সঙ্গী, যার সাথে জীবনের এক কঠিন সফরে বের হয়ে এসেছিল। যার জন্য সে তার সকল আত্মীয় স্বজন, সব ধরনের মায়া-মহব্বতকে পিছনে

ফেলে এসেছিল, সেই আজ তাকে মাঝপথে রেখে বিচ্ছেদের দাগ দিয়ে চলে গেলো! রত্নতুল্য ছোট তিনটি মেয়ে ছিল তার সাথে। আর তার আত্মীয়-স্বজনেরা, প্রিয় মানুষেরা এবং নিকটতম বন্ধু-বান্ধবরা এখান থেকে হাজারো মাইল দূরে অবস্থান করছে। যেখান থেকে তারা তাকে শান্তনা ও সমবেদনা জানিয়ে কয়েকটি শব্দও লিখে পাঠাতে পারবে না। তাহলে এখন সে কি করবে? কোথায় যাবে? সে এখন নিজেকে নিজে অনেক নিঃসঙ্গ, দুর্বল ও অসহায় ভাবতে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো যে, কোন দয়াময় হাত যেন তার হৃদয় থামিয়ে দিয়েছে এবং তার চোখের অশ্রু মুছে দিয়েছে। (তখন সে ভাবতে লাগলো যে,) এই হিজরত ও জিহাদের পথ তো সে আবু খলিলের জন্য গ্রহন করেনি। বরং তা তো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যই ছিল। নিজের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনকে তো সে আবু খলিলের জন্য ছেড়ে আসেনি। বরং তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই ছিল। সুতরাং মহান আল্লাহ, যিনি সকলের চাইতে সবচেয়ে বেশী গুণগ্রাহী। সেই মেহেরবান আল্লাহ তা'আলা কি এমন কঠিন মুহুর্তে তাকে একাকি হালতে ছেড়ে দিবেন? (নাহ, তা হতে পারে না।) ফলে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে সান্ত্বনার বারি বর্ষণ করলেন এবং সামনে বাড়ার হিম্মত দান করলেন।

(হামিদা আরো ভাবলো যে,) আবু খলিল শহীদ হয়েছে তো কি হয়েছে? আল্লাহ তা'আলা তো অবশ্যই সাথে আছেন। আর যদি আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে তার আর কোন চিন্তা থাকতে পারে না। তাই সে পুনরায় জিহাদের পথের পথিক হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। (সে আরো ভাবলো যে,) জিহাদের মত এমন মহান রাস্তায় একবার পা ফেলানোর পর, এখন কি করে আবার পিছনে ফিরে যাওয়া যায়। (নাহ, তা সম্ভব নয়।) অতএব, সে বাচ্চাদেরকে সঙ্গে নিয়েই সামনে অগ্রসর হতে থাকে।

নিশ্চয় আল্লাহ মানুষকে কখনো হাসান আবার কখনো কাঁদান। তাইতো স্বামী আবু খলিলের শাহাদাতের পর আল্লাহ তা'আলা হামিদাকে হানজালার আশ্রয় দান করেন। ধীরে ধীরে হামিদার চিন্তা-পেরেশানী দূর হয়ে যায়। তার শুষ্ক ঠোঁটে আল্লাহ তা'আলা আবার হাসি ফিরিয়ে

দেন। ব্যথিত হৃদয়ে প্রশান্তির দৌলত দান করেন। নিঃসন্দেহে তিনিই দুঃখ প্রদান করেন এবং তিনিই আবার আনন্দ দান করেন। তিন কন্যা সন্তানের পর এবার আল্লাহ তা'আলা হামিদাকে এক পুত্র সন্তান দান করলেন। এতে সে আবারো নিজের ঘর ও বাচ্চাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু তার পরীক্ষা এখানো শেষ হয়নি। তার দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে মাত্র আড়াই বছর হল, এ সামান্য সময় পার হতে না হতেই এক রাতে শত্রুরা তার বাড়িতে হামলা চালায়। প্রিয়তম স্বামী তার চোখের সামনেই তাদের সাথে আমরণ লড়াই করতে করতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।) ফলশ্রুতিতে হামিদা আবারো জিহাদের পথে একা হয়ে গেলেন। পুনরায় জীবনের দ্বীমুখী রাস্তায় উপনীত হলেন।

এক. এখন কি সে বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে নিজ দেশে চলে যাবে? যেখানে তার পিতা-মাতা ও ভাই-বোনেরা রয়েছে, যারা তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ নিরাপদ ও সুরক্ষিত এবং প্রশান্তময় জীবন উপহার দিতে পারবে। ঐ সমস্ত প্রিয়জনদের মাঝে ফিরে যাবে, যাদেরকে ছেড়ে চলে এসেছে প্রায় নয় বছর হয়ে গেল।

দুই. নাকি ঐ পথেই অটল-অবিচল থাকবে, যে পথে তার প্রাক্তন দুই স্বামী জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে।

কিন্তু এবার সে একা সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তার নয় বছরের মেয়ে নিজের চোখের অশ্রু ও তার মায়ের চোখের অশ্রু মুছে দেয় এবং বলে যে, ***"আম্মু! আল্লাহ তা'আলা চাইলে আবারো আব্বুর ব্যবস্থা করে দিবেন, কিন্তু আমরা এখান থেকে কোথাও যাব না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরাও শহীদ হয়ে যাব এবং আব্বু (আবু খলিল) ও হানজালা আব্বুর নিকট পৌঁছে যাব।" (ইনশা আল্লাহ)***

****